বাঙালির নতুন আত্মপরিচয় সূচনার সুচনা

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ - বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই বাঙালি এক বিশিষ্ট সত্তা অর্জন করল-- সাধারণভাবে কথাটাম ানতে বোধহয় কোনো আপত্তি উঠবে না। একে গৌরবময় বঙ্গ বিপ্লব (বিনয়কুমার সরকারের প্রিয় অভিধা) বলা সঙ্গত কিনা -- সে - নিয়ে তর্ক থাকতে পারে। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন যে বাঙলার ইতিহাসে এক জলবিভাজিকা-- এ নিয়ে সন্দেহ নেই। এর পরেই শু হলো একের পর এক সাম্রাজ্যবাদ - বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রথমে ব্যক্তিহত্যা,পরে সামরিক ও গণ - অভ্যুত্থানের প্রয়াস। সর্বভারতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাঙলা তখন থেকেই আগুয়ান। কখনওনেতৃত্বে, কখনও-বা প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের বিরোধিতায়। ভারতের অঙ্গ হলেও আর সকলের থেকে বাঙলা ও বাঙলি যে আলাদা---এ বোধ তখনও কাজ করেছে, এখনও করে।

সে - বোধের ভালো - মন্দ দুই-ই আছে। আপাতত আমরা সে - আলোচনায় যাচ্ছি না। আমাদের প্রশ্ন হলো এ বোধ জাগল কী করে ও কবে থেকে ? প্রশ্নটা শুধু রাজনৈতিক চেতনায় নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি জাতিসত্তার অ াত্মপরিচয়ের প্রশ্ন। নিজেকে আলাদা করে চেনার বিষয়টি একদিকে যেমন অহঙ্কারের---বা কোনো কোনো সময়ে, অভিম ানের --- কারণ হয়েছে, অন্যদিকে আবার এই আত্ম - আবিষ্কার না-হলে জাতিসত্তা হিসেবে তার জাগরণও হতো না। বঙ্গভঙ্গ - বিরোধী আন্দোলনের আগেই তার সূচনা হয়েছিল, যদিও বাঙলার বাইরে, অন্যান্য প্রদেশের কাছে তখনও তা ধরা পড়ে নি।

এই জাগরণের পেছনে যেসব শক্তি কাজ করেছিল এখানে তার একটি দিককে বোঝার চেষ্টা করব।

ডিন্যাশনালাইজেশন থেকে রিন্যাশনালাইজেশন

১২ এপ্রিল ১৯০৮। বঙ্গভঙ্গর বিদ্ধে আন্দোলন, জোর কদমে না হলেও, তখনও চলছে. বাইপুরে সেইউপলক্ষ্যে এক স্ব দেশী সভা। বক্তা বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, অরবিন্দ ঘোষ (পরে শ্রীঅরবিন্দ) প্রমুখ। ভাষণেব শুতেই অরবিন্দ ক্ষমা চেয়ে নিলেন, কারণ বাঙালি শ্রোতাদের কাছে তাঁকে বলতে হবে বিদেশী ভাষায় (বাঙলা পড়তে বা বুঝতে পারলেও বলতে তিনি পারতেন না--- বক্তৃতা দেওয়া তো দূরের কথা)। স্বদেশী আন্দোলনের জন্যে যিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন, ব্যাপারটা তাঁর পক্ষে নিঃসন্দেহে লজ্জার। তিনি শুধু বললেন, এক বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে বিদেশী চি ও প্রবণতার বিকাশ ঘটায় তিনি তাঁর দেশের মতোই জাতীয় ভাব হারিয়ে ফেলেছেন (ডিন্যাশনালাইজ্‌ড্‌)। এখন তাঁর দেশের মতোই নিজেকে তিনি আবার জাতীয়ভাবে ভাবিত করার (রিন্যাশনলাইজ্‌ড্‌) চেষ্টা করছেন।

রিন্যাশনালাইজেশন কথাটি বোধহয় গত শতকের শেষে বা এই শতকের গোড়ায় বেশ চালু হয়েছিল। অরবিন্দ-র মেজদা, কবি মনোমোহন ঘোষ তাঁর বন্ধু লরেন্স বনিয়ন - কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন (৭ জানুয়ারি ১৯১৬) ভ ারতে ইংরেজদের সঙ্গে দেখা হলে শুধু মাথা ঝাঁকানোর মতো পরিচয় বা কাজের সূত্রে যোগাযোগ -- এইটুকুই ঘটতে পারে, আর বিশুদ্ধ বিলিতি শিক্ষাদীক্ষার ফলে ভারতীয়দের সঙ্গে আমার খাপ খায় না, আমায় তারা বলেবিজাতীয়ভা বিত। মনোমোহন অবশ্য কেবল আক্ষেপই করেছিলেন, নিজেকে জাতীয় করে তোলার কোনো উদ্যোগনেন নি, যেমন নিয়েছিলেন তাঁর ভাই।

মনোমোহন বা অরবিন্দ-র সমস্যাটা বোঝা যায়। ডা. কে. ডি. ঘোষ চেয়েছিলেন তাঁর ছেলেরা পাক্কা সায়েব হোক। ভ

ালোমতো তাদের জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার আগেই সকলকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বিলেতে। কিন্তু সে - কথা বলা যাবে ন া তার দু-তিন পুষ আগের ইয়ং বেঙ্গল সম্পর্কে। তাঁদের বেশিরভাগই কখনও ভারতের বাইরে পা রাখেন নি। তবুও তঁ ারা ছিলেন আত্মগর্বী ইংরেজের পাঁচ নম্বর কার্বন কপি। এঁদের সম্পর্কেই অরবিন্দ ১৯১৮-য় একবার লিখেছিলেন, উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে প্রখর দেশপ্রেমিক হলেও মনোভাবের দিক দিয়ে তাঁরা ছিলেন বিজাতীয়ভাবিত। ইয়ং বেঙ্গলকে তিনি নাকচ করে দিয়েছিলেন খানিকটা ব্যঙ্গ করেই এবং যেমন ছিল তাঁদের অধ্যয়ন তেমনি তাঁদের জীবন। অতিকায় ছিলেন তাঁরা, আর সবকিছুই করতেন অতিকায় মাত্রায়। তাঁরা পড়তেন প্রচুর, লিখতেন প্রচুর, ভাবতেন প্রচুর ও মদ খেতেন প্রচুর। এই ভারতীয় - ইঙ্গদের সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে সরোজিনী নাইডু (তিনি নিজেও ইংরিজিতেই কবিতা লিখতেন) মন্তব্য করেছেন, পাশ্চাত্যপ্রেমই বিজাতীয়ভাবিত ভারতীয় যুবকদের তিন পুষকে পশ্চিমের কাছে এক অন্ধ মনগত দাসত্বে বিক্রি করে দিয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে, উনিশ শতকের শেষে বিজাতীয় ভাব কাটিয়ে রিন্যাশনালাইজড্ হয়ে ওঠাই ছিল আধুনিকশিক্ষিত নতুন প্রজন্মের সামনে এক প্রধান চ্যালেঞ্জ, কারণ নতুন চেতনার অঙ্কুর ইতোমধ্যেই দেখা দিয়েছে। সাধারণভাবে তাকে বলা যায় রাজনৈতিক চেতনা।

দুই মত দুই পথ

সে - কাজ শু হয়েছিল দুভাবে

এক বাঙালির বাঙালি - সত্তা প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে,

দুই হিন্দু পুনত্থানের উপজাত (বাই- প্রোডাক্ট) হিসেবে।

বাঙলার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব (পশ্চিমবঙ্গ বলে কোনো আলাদা ভাগের কথা এই সময়কার লেখাপত্রে চোখে পড়ে না)-- এই বিভিন্ন অংশের আঞ্চলিক লৌকিক, আচার ও প্রথাগত ভেদ পেরিয়ে এক অখণ্ড বাঙালি - সত্তা সন্ধানের সচেতন প্রয়াস প্রথম লক্ষ্য করা যায় বঙ্কিমের বাঙ্গালার ইতিহাস প্রবন্ধে(বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮১)। বিদ্যালয়পাঠ্য একটি ইতিহাস -বই এর সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম যেখানে হাজির করেছিলেন এক নতুন ইশ্তেহার। বাঙালি বলতে উনিশ শতকের মনীষীরা অবশ্য বুঝতেন মুখ্যত ও মূলত হিন্দু বাঙলিকে, বা আরও ঠিকমতো বললে, শুধুই বর্ণহিন্দুকে। সামাজসংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রও ছিল সেইটুকুই। বঙ্কিম সমাজসংস্কারে বিশ্বাস করতেন না (শিক্ষার প্রসার হলে আপনা থেকেই সব কু-প্রথা বন্ধ হয়ে যাবে--এই ছিল তাঁর বিশ্বাস), কিন্তু তাঁর চেতনায় বাঙালি সমাজের অন্য একটি দিক ধরা পড়েছিল। জ াতিসত্তা হিসেবে বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মসম্মানবোধ ছিল তার কেন্দ্রে। হাসিম শেখ বা পরাণ মণ্ডলের কোনো জ ায়গাই যে সেখানে ছিল না এমন নয়, কিন্তু বাঙালির ইতিহাস সৃষ্টিতে তাঁরাও যে যোগ দেবেন তেমন ভরসা তিনি করতে পারেন নি। তিনি চেয়েছিলেন, আধুনিক ইওরোপীয় শিক্ষার বাঙালি যুবসমাজ ঘরের দিকে মুখ ফেরাক, নিজের ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটাক, তার মধ্যে দিয়ে লোকশিক্ষার বিস্তার হোক -- সেই পথেই অভীষ্ট ফল পাওয়া যাবে। ইংরেজের বিদ্ধে সে - বাঙালি খে দাঁড়াবে কিনা -- এ বিষয়ে বঙ্কিমের পরিষ্কার কোনো ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। তঁ ার এই সীমাবদ্ধতার কতটা একান্তই ব্যক্তিগত আর কতখানি দেশকালত - আরোপিত -- সে নিয়ে ভাবনার অবকাশ অ াছে। এখানে সুধু লক্ষ্য করার এইটুকুই সম্পূর্ণ ইওরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও স্বক্ষেত্র হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন বাঙলা রচনাকে। খুঁটিয়ে পড়লে বোঝা যায় ১৮৮০ -র দশকের আগের বঙ্কিম আর পরের বঙ্কিম ঠিক এক মানুষ নন। আগের বঙ্কিম যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক, পরের বঙ্কিম ভক্তিবাদী, অনেক বেশি বিশ্বাসপরায়ণ ও রক্ষণশীল। কিন্তু বাঙালি হিসেবে ও বাঙলার লেখক হিসেবে তাঁর সত্তায় কখনোই কোনো ফাঁক দেখা যায় নি।

ইয়ং বেঙ্গল -এর সঙ্গে এখানেই বঙ্কিমের তফাত। বেশিরভাগ ইয়ং বেঙ্গলই বাঙলা লিখতে পারতেন না (প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার অবশ্য ব্যতিক্রম-- সবদিক থেকেই)। অক্ষয়কুমার দত্ত লেখায় কঠিন তৎসম শব্দনিয়ে ইংরিজি শিক্ষিতরা ঠাট্টা - ইয়ারকি করতেন, কিন্তু বিকল্প গড়ে তোলার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। উন্মূল মানুষদের তা থাকেও ন া। জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকাও তাঁরা বেশিদিন চালাতে পারেন নি। বাঙলা গদ্য যখন সবে গড়ে উঠছে সেই সময়েও (প্যারীচঁ াদ মিত্র বাদে) তাঁদের আর কেউ সেখানে কোনো ছাপ রেখে যেতে পারেন নি। ডিরোজিও-র ছাত্রদের পরেও যাঁরা

ইয়ং বেঙ্গল ধারাকে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র স্মরণীয় মানুষ -- মাইকেল মধুসূদন দত্ত । ইয়ং বেঙ্গল অনেক কিছু জানতেন, বুঝতেন, যুক্তিবাদ - নিরীশ্বরবাদ ইত্যাদি ভাবধারা তাঁরা অন্তরস্থ করেছিলেন। কিন্তু তার বীজ বুনতে পারেন নি। কারণটা পরিষ্কার কৃষক - কারিগর দূরস্থান, সদর - মফস্সলের অল্পশিক্ষিত বাঙালির ক াছেও নিজের কথা পৌঁছে দেওয়ার ভাষা তাঁদের জানা ছিল না। এই বিচ্ছিন্নতাই তাঁদের কাল হলো। একটা ছোটো গণ্ডির মধ্যে তাঁদের কৃতিত্ব যতই চমকদার লাগুক, সমাজসংস্কারকদের তুলনায়ও তাঁরা জনসাধারণের অনেক দূরের ম ানুষ। বাঙালি জাতিসত্তা গঠনে তাঁদের ভূমিকা প্রায় শূন্য। অন্যদিকে, বঙ্কিমকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠল বাঙালি জ াতীয়তার এক নতুন রূপ।

এ কথা ঠিক, বঙ্কিমের আগেই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে আরও অনেকে ভাবনা - চিন্তা করেছিলেন, সাধ্যমতো ত ার প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক চেতনার সূচনাপর্বে বঙ্কিমই হয়ে উঠলেন সেই প্রেরণার প্রধান উৎস। অরবিন্দ ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে আমরা সেই ধারার পুরোধা হিসেবে দেখতে পাই।

হিন্দু পুনথানের দ্বান্দ্বিকতা

রিন্যাশনালাইজেশন -এর আর - একটি ধারা দেখা যায় ১৮৮০ ও ৯০ - এর দশকে হিন্দু পুনথানের মধ্যে। মূলত বঙ্গ বাসী পত্রিকার মাধ্যমে রক্ষণশীলতা ছড়িয়ে পড়েছিল বাঙলার গ্রামে - গ্রামান্তরে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্মসম াজের বিদ্ধে কাউন্টার - রিফর্মেশন -এর বাহক হয়ে দেখা দিলেন কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপ াধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ. বঙ্গবাসী প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেন,

পূজার্হ রামমোহন রায়ের মত বঙ্গবাসী - ও আর একবার দেশরক্ষা করিয়াছে। আমরা যেরূপ ইংরাজী সভ্যতার স্রোতে বিজাতীয় (Denational) পথে ভাসিয়া যাইতেছিলাম, বঙ্গবাসী চাবুক পিটাইয়া তাহার গতি কথঞ্চিৎ প্রতিরোধ করিয় াছে। সমাজ সংস্কারের যেমন প্রয়োজন, যাহাতে সংস্কারের শ্রাদ্ধটা গড়াইতে না পারে, বঙ্গবাসী সেই চাবুকের কাজ করিতেছে।

বঙ্গাবাসী-র সবকিছু অবশ্য নবীনচন্দ্রর ভালো লাগে নি। মৃদু আপত্তির সুরে তিনি তাই বলেছিলেন

কিন্তু তাহা বলিয়া দেশের যে সকল বরপুত্র আমাদের ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতির সংস্কারের জন্য যত্ন করিতেছেন, তাঁহ ারা ভ্রান্ত হইলেও তাঁহাদের এরূপ অপাঠ্য ভাষায় গালি দেওয়া নিতান্ত ঘৃণার কার্য্য বলিয়া আমি মনে করি। সকল রকম অন্ধ গোঁড়ামিই মন্দ। বঙ্গবাসী দেশের নিম্নশ্রেণীর অন্ধ বিশ্বাসের প্রশ্রয় দিয়া যেপেশাদারি হিন্দুধর্মের একঘেয়ে রা গিণী ধরিয়াছে, তাহাতে এখন দেশের প্রভূত অনিষ্ট হইতেছে।

সায়েবি আচার ছেড়ে টিকি ফোঁটা গঙ্গাস্নান ইত্যাদি সব পুরনো ব্যাপার ফিরিয়ে আনার এই চেষ্টা ১৮৮০-র দশকের শেষে বাঙালি তণদের একটা অংশের ওপর কিছুটা প্রভাব অবশ্যই ফেলেছিল। চাচন্দ্র দত্ত (১৯৭৬ -১৯৫২ তাঁদেরই একজন। বাঙলার প্রথম গুপ্ত সমিতির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। যে - বিচারকমণ্ডলী কসাই কাজি কিংফোর্ড -এর মৃত্যুদণ্ডর রায় দিয়েছিল, অরবিন্দর সঙ্গে তিনিও ছিলেন তার সদস্য। তিনি লিখেছেন,

প্রথম ইংরেজী শিখে একেবারে রাতারাতি সুসভ্য হওয়ায় যে উৎসাহ দেশে জেগে উঠেছিল সেটা আমাদের সময় অনেকটা মন্দা পড়ে গিয়েছিল। আগে যেটা হয়েছিল তা বানডাকার মতো। আমাদের সময় যা ছিল সেটা যেন নিত্যক ার জোয়ার ভাঁটা।

ব্রাহ্ম পরিবেশে মানুষ হয়েও, চাচন্দ্র খানিক মজা করেই বলেছেন, অকালে (শশধর) তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কবলে কি করে পড়ে গেলাম সেইটেই আশর্চ্য।

ব্যাপারটা শুধুই ধর্মীয় বা সামাজিক ছিল না। আসামেক চা-বাগানে কুলিদের ওপর সায়েবদের অত্যাচারের কথাও চ াচন্দ্র শুনেছিলেন ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত রামকুমার তর্করত্নর কাছে। শুনে মনে মনে ইংরেজ জাতের উপর শ্রদ্ধাভালোব াসা বাড়ে নি সেটা নিশ্চিত। এমনি নানা ঘটনার সঙ্গে ইস্কুল জীবনের শেষের দিকে মূর্ত্তিপূজা, জাত - বিচার, টিকি, টিকটিকি, হাঁচি ইত্যাদি অনেক জিনিস বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলাম। অন্ততঃ বিশ্বাস করি এই কথা জোরে জাহির করতে লাগলাম।

পরিণত বয়েও চাচন্দ্র বুঝতে পারেনি কী করে এমন হলো। তিনি শুধু বলেছেন, কিন্তু এটা ঠিক যে এইপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ভাব খুব স্পষ্ট আর প্রবল হয়ে এল। এর পটভূমি বোঝার জন্যে চাচন্দ্রর স্মৃতিকথা থেকে আরও খানিকটা উদ্ধৃত করা যাক

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও কৃষ্ণপ্রসন্ন (সেন) পরিব্রাজক আমাদের এই সময়কার নেতা। আর বঙ্গবাসী আমাদের এই সময়ের Oracle (দৈববাণী)। এই অবস্থায় কলিকাতায় পড়তে গেলাম। কপাল মন্দ যে সেই বছরেই (১৮৯১) Consent Bill (যাকে তখন সম্মতি আইন বলা হত) পেশ হল। নব হিন্দুভাবের সঙ্গে একে (? এসে) মিশল সরকার বিদ্বেষ। রাস্তায় মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে ঘোরা অভ্যাস হয়ে গেল। মুখে বুলি, ধর্ম্ম গেল, আইন চাই না। যাঁরা সে - আইনের পক্ষপাতী, সবাই হলেন আমাদের শত্রুপক্ষ। কোথায় গেল ভেসে ছেলেবেলাকার কাগজপত্র, সঞ্জীবনী ও নব্যভারত, Liberal ও Indian Messenger, সমস্ত মনটা জুড়ে বসল বঙ্গবাসী ও জন্মভূমি।

সম্মতি আইন ও তারপর

সহবাস সম্মতি আইনের ব্যাপারটা এখন অনেকের কাছেই অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তারপর সার্দা আইন (১৯২৯) ও অন্যান্য আইনের ফলে পরিস্থিতি বদলে গেছে। তাই মূলত ঘটনাটি আর - একবার মনে করা ভালো।

বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্যে উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই অনেক কথাবার্তা হচ্ছিল। এর মধ্যে একটিমারাত্মক ঘটনা ঘটে। পঁয়ত্রিশ বছরের এক স্বামী তার দশ বছর বয়সি স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসের চেষ্টা করে। মেয়েটি মারা যায়। বিচারে স্বামীর এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এর পরেই সহবাসের বয়েস স্থির করার জন্যে নতুন করে উদ্যোগ নেন বেহারাম মালবারি। বড়লাটের ব্যবস্থাপক পরিষদে এ বিষয়ে বিল্ আনেন সার অ্যান্ড জ স্কোবল (৯ জুন ১৮৯১)। প্রস্তাবিত আইনের বিরোধিতা করে সারা ভারত জুড়ে আন্দোলন শু করেন হিন্দু প্রতিক্রিয়াশীলরা (বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর স্মৃতিকথায় এই শব্দদুটিই ব্যবহার করেছেন)। এই উপলক্ষ্যে কলকাতা ময়দানে (রেসের মাঠে)এক বিশাল জনসভা হয় (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১)। ঠিক কত লোক হয়েছিল বলা যায় না, তবে বঙ্গবাসী দাবি করেছিল দু লক্ষ। দ বেঙ্গলী বলেছিল, বিশাল জনসভা, সরকারের কোনো ব্যবস্থার প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত সভার মধ্যে সবচেয়ে বড়। তখনও মাইক্রোফোন-এর যুগ আসে নি। ময়দানের বিভিন্ন জায়গায় ভাগ করে মাচা বেঁধে ভাষণ দেন বক্তারা। বিপিনচন্দ্রও বলেছেন, ময়দানে এই ধরণের সভা এই প্রথম।

ব্যাপারটা এখানেই চোকে নি। বঙ্গবাসী-তে প্রকাশিত কয়েকটি লেখার সূত্রে সরকার তার বিদ্ধে রাজদ্রোহ-র অভিযোগ আনে। পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলী ক্ষমা চেয়ে নেওয়ায় সে-মামলা মিটে যায়। তবে এও মনে রাখা উচিত রাজনৈতিক কারণে বাঙলার এটিই প্রথম রাজদ্রোহ - মামলা।

সম্মতি আইনের বিরোধিতার পেছনে শুধুই সামাজিক রক্ষণশীলতা কাজ করেছিল--এমন ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। এই আইনের বিরোধিতা করেছিলেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রমেশচন্দ্র মিত্র ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহারাষ্ট্রে বাল গঙ্গাধর টিলক। নবদ্বীপ, ভাটপাড়া বা বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ - পণ্ডিতদের সঙ্গে এঁদের এক করে দেখার কোনো কারণ নেই। হিন্দুর সামাজিক জীবনে বিদেশী সরকার বড় বেশি হস্তক্ষেপ করছে-- আইন করে সামাজিক অনাচার বন্ধ করা যাবে না-- এই ধরণের নানা ভাবনা থেকেও অনেকে সম্মতি আইনের বিরোধিতা করেছিল। অর্থাৎ, বিষয়টা হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক। দোহাই মহারাণী, আমাদের ধর্মরক্ষা কন-- এই আবেদন নিয়ে তাঁরা আর দরবার করেন নি। বিশেষত বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত তিনি আপত্তি করেছিলেন আইনটির বয়ানে, অন্য কোনোভাবে আইনের খসড়া করায় তাঁর অমত ছিল না। আর শেষ জীবনে তিনিও প্রবল ইংরেজ - বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। টিলকের ব্যাপারটি আরও চিত্তাকর্ষক। সম্মতি আইনের বিদ্ধে তিনি রীতিমতো খে দাঁড়িয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন পনেরো বছর পুরে যাওয়ার পরেই (কথা ও কাজের এমন অসঙ্গতি খুব একটা খারাপ নয়)! আইনের বিরোধিতার কারণটা ছিল রাজনৈতিক, যদিও তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ ও বিশ্বাস সে-আইনকে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে সমর্থনই করেছিল।

বয়কটের সূচনা

সহবাস সম্মতি আইনেনর প্রতিবাদে বাঙলার আরও একটা ব্যাপার ঘটে ছোটো মাপে হলেও শু হয় বিদেশী মাল বয়কট--- ১৯০৫ -এ আরও অনেক বড় মাপে দেখা দেয়। চাচন্দ্র দত্তর কথাই আবার শোনা যাত যে যবনান্নে চিরক াল এত লোভ ছিল, তা দেশের কল্যাণের জন্য ছেড়ে দিতে হল। এমন কি বিলেতী নুন চিনি পর্য্যন্ত গেল। ঘরে ঘরে ছেলেদের সাবান দেশলাই তৈরী হতে লাগল। বিদ্যাসাগর মশায়ের শ্রাদ্ধে গিয়ে চাচন্দ্র কিছু খেতে রাজি হলেন না। দেখলাম যে খাবার সব এত পরিস্কার যে, নিশ্চয় বিলেতী নুন চিনির তৈরী। আমি বিনয় করে বুঝিয়ে বললাম যে আমি এসব খাই না। পণ্ডিত মহাশয়েরা হেসে উঠলেন, বললেন যে এই কথা। এতে আর কি হয়েছে?ওরে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেরর জলখাবার একখানা নিয়ে আয় তো। অপেক্ষাকৃত মলিন জলখাবার এল। আমার বুকটা দশ হাত হয়ে উঠল। পণ্ডিতদের দেখালাম যে Young Bengal (নব্যবঙ্গ) সব অনাচারী নয়।

বঙ্গবাসী-র দলে চাচন্দ্র অবশ্য বেশিদিন টিঁকতে পারেন নি। তিনি বলেছেন, ব্রাহ্ম আবেষ্টনে জন্ম, তাই গোঁড়ামি যখন এল খুব জোরেই এল। কথায় বলে, হিঁদুর ছেলে যবন হলে, গ খাওয়ার যম, কিন্তু পেটে সয় না যে আমরা তো আর্য্যা মি করতে গিয়ে অজীর্ণ রোগী হয়ে পড়েছি। তবে সেটা স্বীকার করতাম না, দাপটে চালিয়ে নিতাম। তবু চাচন্দ্র মনে করতেন, এই অপগতির একটা স্থায়ী সুফল ফলেছিল সনাতন ধর্ম্মে আস্থা দুতিন বছরেই কেটেগেল, কিন্তু বঙ্গবাসীর অন্য দীক্ষাটা রয়ে গেল। অর্থাৎ ইংরেজ - বিদ্বেষটা মনের মধ্যে ভালো করেই চারিয়ে গিয়েছিল।

পুনথানবাদের দায়ভাগ

এক বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমিতে হিন্দু পুনথানবাদ বাঙলির (গ্রাম ও শহর--- দু জায়গারই) একাংশ-রওপর একটা স্থায়ী ছাপ ফেলেছিল। তার আগে পর্যন্ত ছিল দেশের কুকুর আর বিদেশের ঠাকুর নিয়ে এক মেঠো স্বাদেশিকতা। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে তার প্রতিনিধি বলে ধরা যায়। তিনি ছিলেন একান্ত রাজভক্ত। ইংরেজের অধীনে বাস করেই স্বদেশের ভ াষা - সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে (যাবতীয় কুসংস্কার ও পেছিয়ে - পড়া ধ্যানধারণা সমেত) বাঁচিয়ে রাখারচেষ্টা --এর বেশি কে ানো ভূমিকা তাঁর ছিল না। ব্রিটিশদের তাড়াতে হবে--এমন ভাবনাই তাঁর বা তাঁর মতো দেশভক্তদের মাথায় আসে নি। হিন্দু পুনথানবাদীরাও স্পষ্ট করে তেমন চিন্তা করেন নি। তবু একটা প্রতিরোধের সূচনা হলো তাঁদের হাতেই। অত্যন্ত অন্যায় একটা ব্যাপার নিয়ে তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ গড়ে তুললেন ! একেই বাল প্রগতির দ্বান্দ্বিকতা---ধর্মরক্ষা করতে গিয়ে তাঁরা আমদানি করলেন রাজনীতি, একেবারেই অচেতনভাবে, নিজেদের অজান্তেই। এর একদশক পরেই এই ধার া হয়ে উঠল বিপ্লবী আন্দোলনের মূল প্রেরণা, হিন্দু স্বাদেশিকতার তাত্ত্বিক বুনিয়াদ, এবং আরও কিছুকাল পরে হিন্দু মহাসভা - মার্কা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রধান আশ্রয়।

এর বাস্তব কারণ বিশ্লেষণ করে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন

জাতীয়তাবাদের এই হিন্দু চেহারার অন্য কারণও ছিল।...মুসলমান সমাজ তখন পর্যন্তও বিপ্লববাদের জন্য প্রস্তুত হয় ন াই। পরে ব্রাহ্মসমাজের লোকও পাওয়া যায় নাই। কাজেই বিপ্লববাদ সনাতনী হিন্দুদের মধ্যেই আবদ্ধ হয়েছিল এবং ইহাদের মধ্যেই অনেকেই আবার হিন্দুধর্ম পুনথানকারী দলে ছিলেন, কাজেই বিপ্লববাদ হিন্দু জাতীয়তায় পরিণত হইল।

১৯০২ থেকে বাংলায় যে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির সূচনা --১৯৩৫ পর্যন্ত যার নানামুখী গতি-- বহু দল - উপদলে বিভক্ত এই ধারার সকলেই কিন্তু সমান ধর্মান্ধ ছিলেন না। অনুশীলন দলের মধ্যে, বিশেষ করে পুলিন দাসের ঢাকা কেন্দ্রে, ধর্মীয় ভাব ছিল খুব বেশি। দীক্ষা, শপথ ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠানে রাজনীতিকে করে তোলা হয়েছিল এক নতুন ধর্ম। অন্যান্য দলে কিন্তু এর প্রায় কিছুই দেখা যেত না। সাধারণভাবে যাকে বলা হয় যুগান্তর দল, তাঁদের সংগঠনের নিয়ম-কানুন দীক্ষা বা শপথের বালাই ছিল না। তবু ঘটনা এই যে, সাম্রাজ্যবাদ মনোভাবের পাশাপাশি নব্য হিন্দুত্বও এই ধবণের গুপ্ত সমিতির ভেতর অনেক প্রশ্রয় পেয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে পৃষ্ঠব্রণের মতো বহাল থেকেছে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার পাশাপাশি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা। রিন্যাশনালইজেশন-এর এটি অন্যতম কুফল।

রাজনীতির নতুন ধারা

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে কেন্দ্র করে রিন্যাশনালাইজেশন-এর প্রক্রিয়াটি তুলনায় অনেক বেশি সুফল দিয়েছে। গোপাল হালদার একটা কথা প্রায়ই বলতেন এই শতকে বাঙালির সাহিত্য - সাধনা ও স্বাধীনতার সাধনা একই উদ্যোগের এ-পিঠ ও-পিঠ। মনে রাখা ভালো, হিন্দু বাঙালির সমাজসংস্কার আন্দোলন ও গদ্যরচনার বিকাশও ঘটেছে একই সঙ্গে। রামনোহন ও বিদ্যাসাগর বাঙলা গদ্যর দুই প্রধান রূপকার। আর এই শতকের রাজনীতি - চর্চার প্রয়োজনেই বাঙলা গদ্যর একটা নতুন গণমুখী ধাঁচ গড়ে উঠল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের হাতে। যুগান্তর -এর অনেকেই সুলেখক ছিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম প্রথমেই মনে পড়বে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তারিফ করেছিলেন নির্বাসিতের আত্মকথা-র। অরবিন্দর কারাকাহিনী থেকে শু হয়েছিল কারা - সাহিত্যের ধারা বাঙলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট দিক। সাহিত্যের ইতিহাসকাররা কেন আলাদা করে তার উল্লেখ করেন না ? এধারায় কিছু অসাধারণ বই লেখা হয়েছে যেগুলির সাহিত্যগুণ প্রশ্নের অতীত।

কিন্তু এ তো পরের কথা। বাঙলায় রাজনীতির নতুন পর্যায় শু হয়েছিল বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব ও অরবিন্দর হাতে। তাঁরা অবলম্বন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রকে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বঙ্কিমের সত্যিই কোনো আগ্রহ ছিলনা। তবু, নরমপন্থী কংগ্রেস - নীতির বিকল্প পথের সন্ধান যখন শু হলো, বঙ্কিমই হয়ে উঠলেন তার প্রেরণার মূল উৎস।

কেন বঙ্কিম ? বঙ্কিমের সাহিত্যকীর্তি সম্বন্ধে অরবিন্দর কোনো মাত্রাছাড়া ধারণা ছিল না। ১৯০৭ -এ তিনি লিখেছিলেন, ভবিষ্যতের সাহিত্য - সমালোচকরা হয়তো কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ আর কৃষ্ণকান্তের উইল- কে বড় শিল্পকর্ম বলে মনে করবে, আর দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ, কৃষ্ণচরিত (কৃষ্ণচরিত্র) বা ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে খানিকটা হাতে রেখে প্রশংসা করবে। তবু এই পরের বইগুলির লেখকই আধুনিক ভারতের অন্যতম নির্মাতার মর্যাদা পাবেন। আগের বঙ্কিম ছিলেন কেবলই কবি ও রীতিবিদ্---পরের বঙ্কিম ছিলেন দ্রষ্টা ও জাতি - গঠক। এই বঙ্কিমকেই তিনি বলেছিলেন প্রেরণাদাতা ও রাজনৈতিক গু।

বোঝাই যায়, তখনকার রাজনীতির নিরিখেই দুই বঙ্কিমের ধারণাকে হাজির করা হয়েছে। আমরা যে দুই বঙ্কিমের কথা বলেছি তার থেকে এটি পুরোপুরি আলাদা। তবু আগের ও পরের বঙ্কিমের মধ্যে অরবিন্দ একটা সাধারণ ঐক্যসূত্র লক্ষ্য করেছেন। আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম, অর্থাৎ নিজের ভাষা না পেলে কোনো জাতি তার চিন্তাকে স্থায়ী রূপ দিতে পারে না। বঙ্কিমের প্রথম দান এই যে, বাঙলিকে তিনি আত্মপ্রকাশের ভাষা জোগান দিয়েছেন। অর্থাৎ, ভাষার রূপকার হিসেবেই বঙ্কিম প্রাতঃস্মরণীয়।

অরবিন্দ কিন্তু এই চিন্তা করছিলেন অন্তত ১৮৯৪ থেকেই। বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি প্রবন্ধমালায় তিনি লিখেছিলেন, তণ বাঙালি তার ভাবনা, অনুভূতি ও সংস্কৃতি স্কুল - কলেজ থেকে পায় না, পায় বঙ্কিমের উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে, এ কথা তো সত্য যে ভাষাই জাতির জীবন। অনেক পরে, রাজনীতির সঙ্গে সব প্রত্যক্ষ যোগ ছেড়ে দেওয়ার পরেও, তিনি একই বক্তব্য রেখেছিলেন ভারতে নবজাগরণ (দ রেনেসাঁস ইন ইন্ডিয়া, ১৯১৮) -এ বঙ্কিমের মধ্যে রয়েছে বাঙালি মানসের অতীত, রবীন্দ্রনাথে তার বর্তমান, ভবিষ্যৎ সেখানেই নিহিত। ১৯১৮-য় এ কথা যতটা স্পষ্ট ছিল, ১৮৯৪-এ নিশ্চয়ই ততটা ছিল না। জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার এই স্বীকৃতি বোধহয় অরবিন্দই প্রথম দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়েস তখন মাত্র তেত্রিশ, অরবিন্দর বাইশ !

অবশ্য মধুসূদনের কথাও অরবিন্দ ভোলেন নি। বঙ্কিমের সঙ্গে মধুসূদনকে জুড়ে তিনি বলেন তাঁরা দিয়েছেন (১) বাঙলা সাহিত্য, যা আধুনিক ইওরোপের সবচেয়ে গর্বের ধ্রুপদী রচনার তুল্যমূল্য। (২) বিকে তাঁরা দিয়েছেন বাঙলাভাষা। বাঙলার উপভাষা আর কোনো উপভাষা নয়। এটি হয়ে উঠেছে দেববাণী, বাঙালি জাতির মৃত্যু নাহলে এই অম্লান ও দুর্জয় ভাষা মরতে পারে না। (৩) তাঁরা জন্ম দিছেন এক মানবগোষ্ঠীর যারা তেজিয়ান, সাহসী,নির্মাণক্ষম ও কল্পনাপ্রবণ, পৃথিবীর সবচেয়ে মননশীল জাতিগুলির মধ্যে উন্নত, আর শুধু যদি অধ্যবসায় ও শারীরিকস্থিতিস্থাপকতা পায় তাহলে সবচেয়ে বলীয়ানদের মধ্যে তার উন্নতি ঘটবে।

প্রায় একশ বছর পরে কথাগুলো পড়লে হয়তো একটু বাড়তি আত্মাঘার গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙলা থেকে হাজার মাইল দূরে বসে বাঙালির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই অগাধ আস্থায় একটু অবাক হতে হয় বৈকি ! সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ও আনন্দমোহন বসু অবশ্য তার আগেই গড়ে তুলেছেন ছাত্র সমিতি (স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন)। মাৎসিনি ও গারিবল্‌দি-র নাম বাঙালি তণের বুকে আলোড়ন আনছে। তবু রাজনীতি বলতে তখনও বোঝায় আবেদন -নিবেদনের থালা বয়ে মাথা নিচু করে ভিক্ষে করা। যেহেতু ইংরেজ রাজশক্তিকে আর্জি শোনানোই তার একমাত্র লক্ষ্য, তাই যাবতীয় রাজনৈতিক সভা-সমিতির---এমনকি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনেরও---কাজকর্মের ভাষা ছিল মূলত ইংরিজি। ১৮৯৭-এ নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে এর বিদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করেন রবীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথেব ঘরোয়া-য় তার মনোরম বিবরণ আছে। গর্ব করে তিনি বলেছেন, সেই প্রথম আমরা পাবলিকলি বাংলা ভাষার জন্য লড়লুম।
১৯২৯-এ রবীন্দ্রনাথও স্মরণ করেছেন সেই সম্মেলনের কথা
রাজসাহী - সম্মিলনীতে নাটোরের পরলোকগত মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে চত্রান্ত করে সভায় বাংলাভাষা প্রবর্তন করবার প্রথম চেষ্টা যখন করি তখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি তৎসাময়িক রাষ্ট্রনেতারা আমার প্রতি এক ান্ত ত্রুদ্ধ হয়ে কঠোর বিদ্রূপ করেছিলেন। বিদ্রূপ ও বাধা আমার জীবনের সকল কর্মেই আমি প্রচুর পরিমাণেই পেয়েছি, এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। পর বৎসরে গ্‌ণ শরীর নিয়ে ঢাকা - কনফারেন্সেও আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। আমার এই সৃষ্টিছাড়া উৎসাহ উপলক্ষে তখন এমনতরো একটা কানাকানি উঠেছিল যে, ইংরেজি ভাষায় অ ামার দখল নেই বলেই রাষ্ট্রসভার মতো অজায়গায় আমি বাঙলা চালাবার উদ্‌যোগ করেছি। বাঙালির ছেলের পক্ষে যে গালি সব চেয়ে লজ্জার সেইটেই সেদিন আমার প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছিল, অর্থাৎ ইংরেজি আমি জানি না।
বাঙলা ভাষাকে রাজনীতির জগতে প্রতিষ্ঠা করার এই প্রয়াস ১৯০৫ -এর অনেক আগেই শু হয়েছিল।

স্বদেশী আন্দোলন ও বাঙালির নতুন মর্যাদা
এইসব চেষ্টার সত্যিকারের সুফল দেখা গেল বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে। আগেই বলা হয়েছে, ১৮৯১ - ৯২ -এও ছোটো মাপের একটা বয়কট হয়েছিল। কিন্তু ১৯০৫-০৬-০৭-এর সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হয় না।
শুধু বাঙালির চোখ দিয়ে দেখলে স্বদেশী আন্দোলনের পুরো তাৎপর্য ধরা পড়ে না। ঐ সময়কার দ মরাঠা (পুণে) পত্রিকায় প্রতি সপ্তাহের সম্পাদকীয় ও খবরের বহর থেকে বোঝা যায় বাঙলার বাইরের লোক কতখানি অবাক হয়েছিলেন বাঙালির সাহস ও সঙঘবদ্ধতায়। ১৩ অগস্ট ১৯০৫ সম্পাদকীয়-য় লেখা হয়েছিল দ বেঙ্গলি নেশন। এমন কথা বললে জাতীয় সংহতি ক্ষুন্ন হবে সে ভাবনা বোধহয় টিলক বা কেলকর -এর মাথায় আসে নি। ২০ আগস্ট ১৯০৫ -এর সম্পাদকীয়-য় আশা করা হয়েছিল, বাঙলার এই বয়কট ভারতের সর্বত্রই এক বিরাট ঘটনার সূত্রপাত বলে প্রমাণ হবে। আর সেই সঙ্গে তির্যকভাবে বলা ছিল, দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে উত্তর ভারতে একদিন ঘটেছিল এক বিরাট টালমাটাল।
চরমপন্থী ছিলেন বলে টিলক বা কেলকর না - হয় বাঙালির এই নতুন রূপকে অভিনন্দন জানাতে কুণ্ঠিত হন নি। গোপাল কৃষ্ণ গোখলে-র মতো নরমপন্থী নেতাও কেন উচছ্বসিত হয়ে উঠলেন বাঙালির দ্র রূপ দেখে? বেনারস কংগ্রেস অধিবেশন (১৯০৫) সভাপতির অভিভাষণে তিনি আশর্চ্য ও তুষ্ট (অ্যাশ্‌টনিশ্‌ড্) অ্যান্ড গ্র্যাটিফায়েড) হয়ে সে-কথা স্বীকার করেন ও বলে, সারা ভারত বাঙলার কাছে গভীর কৃতজ্ঞতার ঋণে ঋণী।... তাঁরা (বাঙলার মানুষ) যেন তাঁদের দিক থেকে কখনোই না ভোলেন যে সারা ভারতের সম্মান এখন তাঁদের কাছে গচ্ছিত আছে।
নভেম্বর ১৯০৭-এ বড়লাটের পরিষদ-এ গোখলে-র ভাষণের একটি অংশ আবার শোনা যাক
অনেক দিক দিয়েই বাঙলিরা সারা ভারতে খুবই উল্লেখযোগ্য। তাঁদের দোষত্রুটির কথা বলা সহজ, সেগুলো চোখের সামনেই রয়েছে। কিন্তু তাঁদের অনেক বড় বড় গুণ আছে, মাঝে মাঝে সেগুলো নজরেই পড়ে না। ভারতীয়দের জন্য যত পথ খোলা আছে তার সব কটিতেই বাঙালিরা লক্ষণীয়। সাম্প্রতিক কালে মহত্তম সমাজ - ও ধর্ম - সংস্কারকদের কয়েকজন এসেছেন তাঁদেরই মধ্যে থেকে। বাগ্মী, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ্---বাঙলায় আছেন সবচেয়ে দীপ্তিমান কয়েকজন ব্যক্তি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমি তাঁদের কথা বলব না, কারণ এখানে (বড়লাটের পরিষদে) এই শ্রেণী কমবেশি সুলভ। কিন্তু ধন, বিজ্ঞান, বা আইন, বা সাহিত্য। সারা ভারতে ড. জে. সি. বোস (জগদীশচন্দ্র বসু) বা ড. পি. সি. রায়ের (প্রফুল্লচন্দ্র রায়)পাশে রাখার মতো আর একজন বিজ্ঞানী আপনি আর কোথায় পাবেন ? বা ড. (রাসবিহারী)

ঘোষের মতো আইনজ্ঞ ? বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো কবি ? মি লর্ড, এরা শুধু প্রকৃতির খামখেয়াল নন।
তখনও অবধি বাঙালির অবশ্য একটা বদনাম ছিল শারীরিক সাহসের অভাবে। ঐ বক্তৃতায় গোখলেও তার উল্লেখ করে বলেছিলেন, বাঙালি তণরা এখন সে-দোষ কাটিয়ে উঠেছে।---বাঙালি নিজেও আগে এই আত্মগ্লানিতে ভুগত। কোনো এক কবি দুঃখ করে লিখেছিলেন কোন্ ম্যারাথনে ধরিয়াছ ঢাল ?/ কোন্ ইতিহাস তব নাম করে ?/ ভূতলে শুধুই ছিছি ছিছি রব। ১৯০৮ থেকে বাঙলার বিপ্লববাদীরা সে - কলঙ্ক চিরতরে ঘুচিয়ে দিলেন। মোটক-হাজার (বা ক-শ ?) কর্মী বিপ্লববাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেটা খুব বড় কথা নয়। নিশ্চয়ই মোট বাঙালির ০১১ শতাংশ -ও হবে না। তবুও ক্ষুদিরাম - প্রফুল্ল চাকী থেকে বিনয় - বাদল - দীনেশ পর্যন্ত কিছু তণের কল্যাণে গোটা বাঙালি জাতির বদনাম ঘুচে গেল। বাঙলার বাইরে তার এই পরিচয়ই বরং প্রধান হয়ে উঠল বাঙলি মরতে ভয় পায় না, উল্‌টে অকুতোভয়ে ইংরেজকে বোমা মারে।

বাঙালি মুসলমান ও তার বাঙালিত্ব
অনিবার্য কারণেই ১৯০৫ ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে যেতে হয়েছে। আবার ১৯০৫-এই ফেরা যাক। স্বদেশী, বয়কট ও বঙ্গ ভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে বাঙলার মুসলমান সমাজের বেশিরভাগই যোগ দেন নি--এটা তথ্য। কিন্তু যাঁরাযোগ দিলেন, তাঁরাও এলেন এক নতুন চেতনা নিয়ে।
অক্টোবর ১৯০৫ -এ পার্সিবাগান স্কোয়ার-এ মুসলমানদের এক সভায় আবদুল্লা রসুল (বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি) বলেছিলেন,
...আমি দেখেছি বাঙলার কিছু মুসলমান -- বাঙলার হিন্দুদের মতোই যাঁরা বাঙালি -- নিজেদের মুসলমান বলে। নিঃসন্দেহে এটি ঘটে অজ্ঞতার কারণে, কিন্তু কী করে এই অজ্ঞতা এল ? এল এই ঘটনা থেকে যে অতীতে মুসলমানরা যে- দেশে থেকেছেন ও বড় হয়েছেন তার দিকে তাঁরা তাকান নি, তাকিয়েছেন ধর্মের দিকে।
তিনি আরও বলেছিলেন,
যদি ভিনদেশে আমার সঙ্গে একজন বাঙালি হিন্দু আর একজন তুর্কির দেখা হয়, বাঙালি হিন্দুকেআমি আলিঙ্গন করব আমার দেশবাসী বলে, তুর্কিকে নয়। তাঁকে আমি আলিঙ্গন করতে পারি সহধর্মী হিসেবে। আমরা, হিন্দু ও মুসলমান দুজনেই একই মাতৃভূমি---বাঙলার লোক। আমরা সবাই বাঙালি, যদিও বিভিন্ন ধর্ম আমাদের হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান করেছে।
স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্রে ধর্মচেতনা বা ভারতচেতনার চেয়ে এই বাঙালি-চেতনাই অনেক বেশি কাজ করেছিল। কোনো সর্বভারতীয় চেতনা যে ছিল না তা নয়। হিন্দু মেলা বা জাতীয় কংগ্রেসের আগে অবধি যত প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজ হয়েছে তার প্রায় সবই ছিল ভারতচেনায় উদ্‌বুদ্ধ। বঙ্গভঙ্গ - বিরোধী আন্দোলনের সূত্রে কিন্তু বাঙালি - চেতনাই জোরদার হলো। শুধু বাঙলার ইতিহাস নয়, তার লোকশিল্প, পরম্পরা ইত্যাদি নিয়েও সন্ধান ও গবেষণারঝোঁক দেখা দিল প্রচুর পরিমাণে। যথারীতি, বিষয়নিষ্ঠার চেয়ে বিষয়ীর অতিরেকই তাতে প্রবল। কিন্তু বঙ্কিমের আক্ষেপ এইভাবেই মেটানোর চেষ্টা হলো। এই পটভূমিতেই রবীন্দ্রনাথের ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ (চৈত্র ১৩১১ বঙ্গাব্দ)-এর এই কথাগুলির প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা যায়।
যাহা হউক, ইহা দেখা যাইতেছে যে, সকল দিক দিয়াই আমরা নিজের স্বাধীন শক্তির গৌরব অনুভব করিবার একটা উদ্যম অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতেছি---সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া পলিটিক্‌স পর্যন্ত কোথাও ইহার বিচ্ছেদ নাই।
এই সূত্রেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ -এর মতো প্রতিষ্ঠানও এই নতুন চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ল।
ভারত ছেড়ে বাঙালাকে নিয়ে ভাবনার অন্য একটা বৈষয়িক কারণও ছিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে নৈতিক সমর্থন জুটলেও আসল কাজে বিশেষ সুবিধে হয় নি। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন
বাঙ্গালা যেমন বিলাতী কাপড় বর্জন সঙ্কল্প করিল,, বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালারা তেমনি কাপড়ের মূল্য বাড়াইয়া দিয়া সেই সুযোগে লাভবান হইতে লাগিলেন। তাঁহারা কাপড়ের মূল্য এত অধিক বাড়াইয়া দিলেন যে, তাঁহাদিগকে সঙ্গত লাভে সন্তুষ্ট থাকিতে অনুরোধ করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ (বন্দ্যোপাধ্যায়)প্রমুখ নেতারা উপেন্দ্রনাথ সেন ও

সুরেন্দ্রনাথ মল্লিককে বোম্বাইয়ে পাঠাইলেন। তাহাদিগের কথা শুনিয়া বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা, বলিলেন, বাঙ্গালা যদি ভাবাবেগে নির্বোধের মতো কার্য করে, তবে ব্যবসায়ীরা সেই সুযোগে লাভ করিতে বিরত হইবে কেন?
সে যা-ই হোক, হিন্দু - মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালিত্বের চেতনা এই সময় থেকেই তৈরি হয়ে যায়। এই চেতনার অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার। তিনি বিশ্বাস করতেন ও বলতেন, হাজার হাজার বছর ধরে (অতকাল আগে অবশ্য বাঙলা ভাষাও ছিল না, বাঙালির আলাদা জাতিসত্তাও ছিল না!) বাঙালি মানবগোষ্ঠীর মূল ধর্ম রয়ে গেছে বাঙালিত্ব (বেঙ্গলিসিজম)। হিন্দুত্ব ও ইসলাম -- দুই-ই তার পরধর্ম। পশ্চিম এশিয়ার ও উত্তরইসলাম ধর্ম বঙ্গদেশে আসিয়া সনাতন বঙ্গধর্মের প্রভাবে বাঙালীকৃত হইয়াছে। বাঙালী মুসলমানের ধর্ম্ম দুনিয়ার অন্যান্য মুসলমানের ধর্ম্ম হইতে বেশ কিছু পৃথক। লোকায়ত বাঙালীর প্রভাবে ইসলামের ভোল যথেষ্ট বদলাইয়াছে।
কীসের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে এই বাঙালিত্ব ? বিনয়কুমার সরকারও এ বাবদে জোর দিয়েছেন ভাষার ওপর
বাঙালী হিন্দুদের উপর সংস্কৃত ভাষা যতটুকু জাঁকিয়া বসিয়াছে, বাঙালী মুসলমানদের উপর আরবি ও পার্সি ভাষা এমনকি ততটুকুও চাপিয়ে বসে নাই। বাঙলা ভাষাই বাঙালী মুসলমানের প্রাণের ভাষা। ভক্তি ও শক্তি প্রকাশের জন্য ব াঙালী মুসলমান আরবি ও ফার্সি বয়েৎ অপেক্ষা বাঙলা শব্দ ও বাক্যই বেশি ব্যবহার করিয়া থাকে। বাঙলা সাহিত্যেই বাঙালী মুসলমানের আসল-আসল কোরাণ বিরাজ করিতেছে। এই সকল বিষয়ে যাঁহা হিন্দু তাঁহা মুসলমান। অর্থাৎ দুই মিঞাই বিদেশী ভাষাকে কলা দেখাইয়া স্বদেশী ভাষায় ধর্ম্ম - অর্থ- কাম - মোক্ষ চালাইতে অভ্যস্ত। জননী বঙ্গভাষা দুইয়েরই দরদ মিটাইয়া থাকে।
কথাগুলো কত সত্যি সেটা আখেরে বোঝা গিয়েছিল ১৯৪৮ -এ ও তারপর ১৯৫২-য় পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু চাপানে ার বিদ্ধে যখন বিদ্রোহ করলেন ভাঙা বাংলার মুসলমান সমাজ।

বাঙালি জাতিসত্তার স্বরূপ

আলোচনাটা এবার গুটিয়ে আনা যাক।
বাঙলা ভাষাকে কেন্দ্র করে বাঙালি ঐক্যর এক চেতনা সঞ্চার করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। রাজনীতির সূত্রে তাকে সামনে এনেছিলেন অরবিন্দ। কিন্তু দু-এর মধ্যে একটা বড় তফাতও আছে। বঙ্কিম যে -বাঙালির কথা ভাবতেন তার গৌরব ছিল অতীতে--ধর্ম, কাব্য, নব্যস্মৃতি ও নব্যন্যায়ে। তাঁর কাছে রেনেসাঁস ছিল চৈতন্যর যুগ। কিন্তু অরবিন্দর কাছে সে-যুগের মূল্য খুবই কম। উনিশ শতককেই তিনি দেখেন বাঙালির রেনেসাঁস-এর পর্ব হিসেবে। বঙ্কিমের চেতনায় র াজনীতির প্রায় কোনো গুত্বই ছিল না। অরবিন্দর চেতনায় রাজনীতিই কেন্দ্রবিন্দুতে। বঙ্কিম যেখানে পশ্চাদ্‌মুখী, অরবিন্দ প্রাঙ্‌মুখী। ভারতীয় 'বিজাতীয় কংগ্রেস' ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অবজ্ঞাভরে উড়িয়ে দিয়ে, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল থেকে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় - সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - লালমোহন ঘোষ প্রমুখের আইনসভা-সর্বস্ব র াজনীতিকে বাতিল করে অরবিন্দ ডাক দিলেন বাঙালির নতুন রাজনৈতিক জাগরণের।
প্রশ্ন উঠতে পারে বাঙালি বলতে অরবিন্দও তো মূলত হিন্দু বাঙালিকেই বুঝতেন ? হ্যাঁ, কিন্তু দেখার ব্যাপার হলো, ত াকে তিনি হিন্দু বলে চিহ্নিত করেন নি, করেছেন বাঙালি বলে। ভাষাকে কেন্দ্র করেই এই জাতিসত্তার স্বরূপ তাঁর চোখে নতুন তাৎপর্য পেয়েছিল।

উপসংহার

বঙ্গভঙ্গ - বিরোধী আন্দোলন ও তার পরে জাতীয় বিপ্লববাদী কাজকর্মর দন বাঙালির আত্মপরিচয় সত্যিই এক নতুন র ূপ পেল। একে অবশ্য রিন্যাশনালাইজেশন বলাটা ভুল, কারণ এর মধ্যে কোথাও ফিরে পাওয়ার ভাব নেই, বরং অ াছে এগিয়ে চলার ডাক। বাঙালির উৎস সন্ধানের জন্যে ঐতরেয় আরণ্যক বা প্রাচীন সাক্ষ্য খোঁজার কাজ অবশ্য তার পরেও চলেছে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় - প্রকাশিত হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল বা নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙ্গালীর ইতিহাস-এ তার নমুনা আছে), কিন্তু ১৯০৫ - উত্তর বাঙালির সঙ্গে প্রাচীন বা মধ্যযুগের বাঙালির এক গুণগত পার্থক্য দেখা দিল। সুনীতিকুম ার চট্টোপাধ্যায় একবার লিখেছিলেন

বাঙ্গালীর ইতিহাসের আলোচনা করিতে গেলে, তাহার সংস্কৃতির আলোচনাই মুখ্যবস্তু হইয়া পড়ে। জাতি হিসাবে বাঙালীর রাষ্ট্রনৈতিক কৃতিত্ব বিশেষ লক্ষণীয় নহে।

কথাটা অতীতের সম্বন্ধে যতই সত্যি হোক, আধুনিক যুগ সম্পর্কে একেবারেই অচল। জাতীয় বিপ্লববাদ বাঙালির নিজের সৃষ্টি। তার তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিরাগের কথা সকলেই জানেন। তবু ১৯৩৯-এ, জীবনের শেষপ্রান্তে এসে, তিনিও তাকে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি দিলেন কিন্তু সেই দাণ ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতার মধ্যে বীরহৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত হয়েছিল, সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাও তো তা দেখিনি। সেই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছিলেন বাঙালির স্বভাবে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার কয়েকটি লক্ষনের তার সরসতা, তার কল্পনাবৃত্তি, তার নতুনকে চিনে নেবার উজ্জ্বল দৃষ্টি, রূপসৃষ্টির নৈপুণ্য, অপরিচিত সংস্কৃতির দানকে গ্রহণ করবার সহজ শক্তি।

এর সব কটি লক্ষণ কিন্তু অতীতের বাঙালির ছিল না। বিশেষ করে শেষ তিনটি লক্ষণ তো একেবারেই গত দুশ বছরে অর্জন করতে হয়েছে। এই শতকের বাঙালিকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত চিনতেই পারতেন না, পছন্দও করতেন না। বঙ্কিম মনে করতেন, গুপ্ত কবিই শেষ খাঁটি বাঙালি কবি। কথাটা একদিক দিয়ে ঠিকই--- যদিও বঙ্কিম কথাটা বলেছিলেন দুঃখ করে। বাঙালির ডিন্যাশনাল চেহারা দেখে তিনি ক্রমশই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, তার থেকেই এই মন্তব্যের জন্ম। কিন্তু ইতিহাসের প্রবাহে সেই ডিন্যাশনাল ভাবও কেটে গেল, দেখা দিল আত্মপ্রত্যয়ের এক গরীয়ান মূর্তি। ভারত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নয়, অন্যের চেয়ে নিজেকে বড় ভেবেও নয়, বরং সমস্ত আগুয়ান জাতির সমকক্ষ হিসেবে নিজের ভাগ্য নিজেই স্থির করার দাবি নিয়ে সে হাজির হলো বিশ্বের দরবারে। ধর্ম বা নৃকুলগত (এথনিক) বৈশিষ্ট্যের সুবাদে নয়--- শুধু ভাষাকে কেন্দ্র করেই এই আত্মপরিচয় হয়ে উঠল বাঙালি জাতীয়তার কেন্দ্র। ধুতি পরা বা মাছ খাওয়া, মিতাক্ষরার বদলে দায়ভাগ বিধি, হানফি মত না হানবলি মত--সবই গেল গৌণ হয়ে।ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, বা পৃথিবীর যে প্রান্তেই বাঙলাভাষী মানুষ বাস কক, এই ভাষাকেন্দ্রিক ঐক্যবোধই তাকে বেঁধে রাখে এক অদৃশ্য কিন্তু দৃঢ় বন্ধনে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা ইত্যাদির চাপে তা ব্যাহত হলেও এখনও অবধি পারহত হয় নি।

প্রবাসী বঙ্গাসাহিত্য সম্মেলন, ১৩৩০-এ সভাপতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ বাঙালির যে-সংজ্ঞার্থ দিয়েছিলেন সেটিই এখনও বহাল আছে

তাই বলছি, বাঙালি (অবিভক্ত) বাংলাদেশে জন্মেছে বলেই যে বাঙালি তা নয়, বাংলাভাষার ভিতর দিয়ে মানুষের চিত্তলোকে যাতায়াতের বিশেষ অধিকার পেয়েছে বলেই সে বাঙালি। ভাষা আত্মীয়তার আধার, তা মানুষের জৈব - প্রকৃতির চেয়ে অন্তরতর। আজকের দিনে মাতৃভাষার গৌরববোধ বাঙালির পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হয়েছে, কারণ, ভাষার মধ্যে দিয়ে তাদের পরস্পরের পরিচয় সাধন হতে পেরেছে এবং অপরকেও তার আপনার যথার্থ পরিচয় দান করতে পারছে।